সিপাহি বিদ্রোহের দালালেরা এবং একটি স্মৃতিকথা

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

লেখকের কথা

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ, যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে খ্যাত, সেই সংগ্রাম ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ সংগ্রাম স্থায়ী ছিল মাত্র চার মাস। ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সূচিত বিদ্রোহের অবসান ঘটে ১৮৫৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল মোগল রাজধানী দিল্লি। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে প্রতীকী কেন্দ্রীয় শাসক হিসেবে গ্রহণ করে বিদ্রোহীরা তাদের সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছিল কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি ও গোয়ালিয়রসহ উত্তর ও মধ্য-ভারতজুড়ে প্রায় সর্বত্র। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুখ্যত বেরেলির বখত খান, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈ, মারাঠা নেতা কানপুরের দ্বিতীয় পেশোয়া নানা সাহিব, গোয়ালিয়রের তাতিয়া টোপি, বিহারের কুনাওয়ার সিং, এলাহাবাদ ও বেনারসের মৌলভি লিয়াকত আলী, ফৈজাবাদের মৌলভি আহমদউল্লাহ শাহ-সহ আরও অনেক নেতা।

সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার বহুবিধ কারণ ছিল, যার মধ্যে বিদ্রোহীদের মধ্যে পরিকল্পনা ও ঐক্যের অভাব এবং অস্ত্র ও রসদ সরবরাহে পরিকল্পিত উৎস না থাকা, একীভূত কর্মসূচি ও অভিন্ন আদর্শের অনুপস্থিতি অন্যতম। তাছাড়া বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তি ও রণকৌশলের বিপরীতে ব্রিটিশ বাহিনীর সমর-নৈপুণ্য, উন্নত অস্ত্রশস্ত্রসহ সামরিক শ্রেষ্ঠত্বও বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ ছিল। বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হলেও তাদের সামনে সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ফলে তাদেরকে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে সামনে রেখে পুরোনো সামন্তবাদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এ ব্যবস্থা দ্বারা ব্রিটিশদের নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসনিক পদ্ধতির মোকাবিলা করা বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল নেটিভ ইনফেন্ট্রির সিপাহিরা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন এ বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি এবং সকল দেশীয় সিপাহি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। যদিও ওই সময়ের ব্রিটিশ-

ভারতের রাজধানী কলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পাণ্ডে নামক এক ব্রাহ্মণ সৈনিক ব্রিটিশদের চালু করা নতুন এনফিল্ড রাইফেলে চর্বি মেশানো কার্তুজ (হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের ধর্মনাশের উদ্দেশ্যে কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বি মেশানো ছিল বলে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল) দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে তার ইংলিশ কমান্ডারকে গুলি করে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘটানোর দাবিদার, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে দেশীয় সিপাহিরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য করেছে। সিপাহি বিদ্রোহে শিখদের কোনো সমর্থন ছিল না; কারণ তারা এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতে মোগল শাসনের পুনরুত্থানের আশঙ্কা করেছিল। তাদের দশ গুরুর মধ্যে দুজন গুরুকে মোগল শাসকরা হত্যা করায় তারা বিদ্রোহকে মুসলিম প্রভাবিত বলে বিবেচনা করেছে।

ভারতের কৃষক শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, শিক্ষিত ভারতীয়দের বিরাট অংশ সিপাহি বিদ্রোহে তাদের সমর্থন দেওয়ার পরিবর্তে বিরোধিতা করেছে। তদুপরি অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজা, মহারাজা ও জমিদারগণ ব্রিটিশ রাজশক্তির পক্ষে ছিল। যেসব বড় বড় রাজ্য ব্রিটিশ আইনের ফাঁদে অযোধ্যা ও ঝাঁসির মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সংযুক্তি করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে, সেসব রাজ্যের সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমান্ডের অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহী বাহিনীতে কখনো শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব হয়নি।

এসব কারণ ছাড়াও দিল্লিতে বিদ্রোহের মোগল দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত বেশ কিছু সংখ্যক দালাল। বিদ্রোহীরা যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে দিল্লি থেকে পুরোপুরি উৎখাত করেছিল, এসব দালালের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ বাহিনী সহজে দিল্লি পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ইংরেজ রাজশক্তিকে আরও নব্বই বছর ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন, ভারতবাসীর ওপর নিপীড়ন চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। এই দালালেরা দরবারের সব আলোচনা, সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে অথবা মৌখিকভাবে তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে পৌঁছে দিতেন। সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হলে তাদের সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে বিদ্রোহীদের ওপর আঘাত হানা সহজ হয়েছিল। ব্রিটিশদের নিয়োজিত গুপ্তচরেরা বিদ্রোহীদের যুদ্ধ পরিকল্পনা, তাদের সংখ্যা, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সম্পর্কিত খবর সরবরাহ করত। এসব গুপ্তচরের অন্যতম ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও উজিরে আজম হাকিম আহসানউল্লাহ খান, ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের নিয়োজিত মুনশি জীবন লাল, বাদশাহর পুত্র মির্জা ফখরুর শ্বশুর মির্জা ইলাহি বখশ এবং মৌলভি রজব আলী।

বাদশাহর প্রিয়তমা ও কনিষ্ঠা স্ত্রী বেগম জিনাত মহলও দিল্লিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। যদিও তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তার স্বামীর জীবনাবসানে তার গর্ভজাত পুত্র শাহজাদা মির্জা জওয়ান বখতকে পরবর্তী মোগল উত্তরাধিকারী হিসেবে ব্রিটিশদের স্বীকৃতি আদায় করা, কিন্তু

তিনি শুরু থেকেই সিপাহি বিদ্রোহের প্রবল বিরোধী এবং তার এ মনোভাব যাতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে গোপন না থাকে, সেজন্য তিনি তাদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখাকে প্রাধান্য দিতেন। বিদ্রোহী সেনা অফিসাররা তার প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন। তারা রানি জিনাত মহল এবং হাকিম আহসানউল্লাহ খানের বিরুদ্ধে বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের কাছে অভিযোগও উত্থাপন করেছিলেন। বাদশাহ তাদের অভিযোগ আমলে না নিলে বিদ্রোহীরা এক পর্যায়ে হাকিম আহসানউল্লাহ খানের বাড়িতে লুণ্ঠন চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা হাকিম আহসানউল্লাহ খানকে আটক করলে বাদশাহর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি লাভ করেন। হাকিম আহসানউল্লাহ সিপাহি বিদ্রোহকালে দিল্লিতে সংঘটিত প্রতিদিনের বিবরণী লিখে রাখতেন অথবা তার স্মৃতিতে ছিল, যা পরবর্তীতে 'মেমোয়ারস অফ হাকিম আহসানউল্লাহ খান' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। আমি সেটির বাংলা অনুবাদ করে উপস্থাপন করেছি।

দরবারে নিয়োজিত ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের ভারতীয় এজেন্ট মুনশি জীবন লাল প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন। তিনি দরবারের প্রাত্যহিক বিবরণী লিখতেন এবং তা ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে পাঠাতেন। তার এ বিবরণী 'মুনশি জীবন লালের রোজনামচা' নামে পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত বিদ্রোহের সময়ও তার এ কাজ অব্যাহত ছিল। মেজর হডসন তার নেতৃত্বে 'হডসন হর্স' নামে অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দা দল গড়ে তুলেছিলেন বিদ্রোহী বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য লাভের জন্য। তিনি তার গোয়েন্দা দলে মুনশি জীবন লাল, মৌলভি রজব আলী এবং মির্জা ইলাহি বখশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই গুপ্তচর বাহিনীতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য থাকায় বিদ্রোহীদের তৎপরতা সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য ব্রিটিশদেরকে দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো।

এই বিশ্বাসঘাতকেরা যে কেবল বিদ্রোহী দেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও গতিবিধি সম্পর্কেই ব্রিটিশ বাহিনীকে তথ্য সরবরাহ করত তা নয়, তারা কখন কীভাবে বিদ্রোহীদের ওপর হামলা পরিচালনা করতে হবে, সে সম্পর্কেও পরামর্শ দিতেন ইংরেজ বাহিনীকে। ব্রিটিশ মনিবের পক্ষে তারা উশকানিদাতা হিসেবেও কাজ করতেন। তারা দিল্লি নগরীর সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতেন এবং বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের ঘনিষ্ঠ মহলেও তাদের বিচরণ ছিল।

শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সিপাহি বিদ্রোহের অবসান ঘটলে এই দালালেরা ব্রিটিশ মনিবের সেবায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে উত্তমরূপে পুরস্কৃত হয়েছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শামসুল ইসলাম সম্পাদিত 'জীবন লাল: ট্রেইটর অফ মিউটিনি' গ্রন্থে দালালদের পুরস্কৃত করা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

মৌলভি রজব আলী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তার দালালির পুরস্কার হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাভ করেন ১০,০০০ রুপি। মুনশি জীবন লাল উত্তরাধিকার সূত্রে মোগল রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন মোগল

সম্রাট আওরঙ্গজেবের উজিরে আজম। বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লি দখল করার পর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে একবার মুনশি জীবন লালকে গ্রেফতার করেছিল। মির্জা ইলাহি বখশ মোগল বাদশাহর ওপর তার প্রভাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও জীবন লাল ব্রিটিশ আনুগত্য ত্যাগ না করে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার জীবন লালকে তার খেদমতের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে সম্মানসূচক ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিয়োগ করে। বাদশাহ জাফরের বেয়াই মির্জা ইলাহি বখশ তার ব্রিটিশ আনুগত্যের স্বীকৃতি লাভ করেন নগদ অর্থ, উপাধি ও সম্পত্তির মালিকানার আকারে। বাহাদুর শাহ জাফর যাতে দিল্লি ছেড়ে চলে না যান, সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং হুমায়ুনের সমাধি থেকে তাকে এবং পরবর্তীতে তার তিন পুত্রকে মেজর হডসনের কাছে আত্মসমর্পণ করানোর ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল মুখ্য।

মেজর হডসন তার ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন যে, তার বেতনভুক আরও দেশীয় গুপ্তচর ছিল, যারা ব্রিটিশদের পক্ষে কাজ করেছে। তিনি তাদের মাধ্যমে বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে, দিল্লিবাসী ও নগর প্রতিরক্ষায় আগত সৈন্যদের মধ্যে এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী বাহিনীর হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের মধ্যে অনৈক্য ও ক্ষোভের বীজ বপন করতেও সফল হয়েছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহ দমন করার পর ভারতীয় সৈন্যরা যাতে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের বিদ্রোহ ঘটাতে না পারে সেজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের সামরিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন এবং কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে ছিল:

- ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে প্রধান প্রধান ভৌগোলিক ও সামরিক অবস্থানে মোতায়েন।
- সেনাবাহিনীর ভারতীয় অংশকে ‘বিভাজন ও শাসন’ নীতিতে সংগঠিত করা।
- দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হওয়ার মনোভাব রোধ করার উদ্দেশ্যে বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চলভিত্তিক রেজিমেন্ট গঠন।

এছাড়া সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের ভারত শাসনে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন আনা হয়। বিদ্রোহের এক বছরের মধ্যে ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ আইন অনুযায়ী একজন সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া একটি কাউন্সিলের সহায়তায় ভারত শাসন করবেন, যা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরর্স এর কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো।

সাধারণভাবে ভারতের জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে শাসন (ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি) করার নীতি চালু করা হয়। ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিদ্রোহের

জন্য মুখ্যত মুসলমানদের দায়ী করে তাদের ওপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। তাদের সম্পত্তি ব্যাপকভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হতে থাকে; বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল সন্দেহে হাজার হাজার মুসলিমকে কামানের সামনে বেঁধে, ফাঁসিকাষ্ঠে বা গাছের ডালে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে; সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতে থাকে। সরকারের গৃহীত এসব নীতির কারণে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত নীতি ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে অনৈক্য, ধর্মীয় ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল, তার খেসারত সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলিম জনগণ আজও দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে 'সিপাহি বিদ্রোহের দালালেরা এবং একটি স্মৃতিকথা' উপমহাদেশের ইতিহাস পাঠে আগ্রহীদের জন্য একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ বলে বিবেচনা করি।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সূচিপত্র

হাকিম আহসানউল্লাহ খানের পরিচয় ১৫
স্মৃতিকথার ভূমিকা ১৭
ইউরোপীয়দের হত্যাকাণ্ড : জহির দেহলভির বিবরণ ৪০
পরিশিষ্ট ৮১
সিপাহি বিদ্রোহ চলাকালে প্রতিদিনের ঘটনাবলি ৮৩
সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে যারা দায়ী ১১৩
যেভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয় ১১৮
জিনাত মহলের উচ্চাভিলাষ, বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি ১২৯
দালালদের সম্পর্কে 'দ্য লাস্ট মোগল' গ্রন্থে ড্যালরিম্পেলের বর্ণনা ১৩২
শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বিচার ১৪৪
হাকিম আহসানউল্লাহ খানের সাক্ষ্য ১৪৫

হাকিম আহসানউল্লাহ খানের পরিচয়

হাকিম আহসানউল্লাহ খান তার পিতার নিকট থেকে হিকমতের কলা বা একজন চিকিৎসকের কাজ শিখেছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে তার এমন সুনাম ছিল যে, কোনো চিকিৎসক যদি কোনো রোগীকে নিরাময় করতে সক্ষম না হতেন, তাহলে তিনি তার রোগীর আরোগ্য লাভের উপায়ের জন্য পরামর্শ গ্রহণ করতে হাকিম আহসানউল্লাহ খানের কাছে আসতেন। শাহজাহানাবাদের বাসিন্দারা দলে দলে তার কাছে আসতেন তার চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য। মোগল সম্রাট মঈন-উদ-দীন মোহাম্মদ আকবর শাহের কাছে তার সুনাম পৌঁছলে তিনি তাকে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ জাফরও হাকিম আহসানউল্লাহ খানকে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেন। আহসানউল্লাহ খান সম্রাটকে তার চিকিৎসাসেবা দান ছাড়াও প্রশাসনিক পরামর্শ দিয়ে অধিক সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী হন এবং পদোন্নতি লাভ করেন। সম্রাট তাকে 'ইহতেরাম-উদ-দৌলা সাবিত জং' খেতাবে ভূষিত করেন। পর্যায়ক্রমে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর সকল বিষয়ে হাকিম আহসানউল্লাহ খানের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তা তার স্বাস্থ্যগত বিষয়ে হোক অথবা রাজকার্য সম্পর্কিত হোক। প্রধান উজির মাহবুব আলী খান যখন শোথ রোগে আক্রান্ত হন, তখন সম্রাট আহসানউল্লাহ খানকে কেল্লার সকল বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান এবং তাকে প্রধান উজির হিসেবে নিয়োগ করেন।

তিনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। হালকা-পাতলা গড়নের দীর্ঘ শ্বেতশুভ্র দাড়িবিশিষ্ট হাকিম আহসানউল্লাহ খান ছিলেন উর্দু কবি মির্জা গালিবের সমসাময়িক। তিনি রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মোগল দরবারে নিয়োজিত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট টমাস থিওফিলাস মেটকাফ অনেক সময় তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করতেন। তিনি ইউনানি চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থের নাম

'আহসান আল-কারাবাদিন' । হাকিম আহসানউল্লাহ্ খানকে রানি জিনাত মহল গুরুত্ব দিতেন এবং তার মন্ত্রণা গ্রহণ করতেন ।

হাকিম আহসানউল্লাহ্ খান ছিলেন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের অন্যতম বিশ্বস্ত ব্যক্তি । ১৮৫৭ সালের আগে আহসানউল্লাহ্ খানের সাথে জিনাত মহলের এক ধরনের অস্বস্তিকর সম্পর্ক থাকলেও সিপাহি বিদ্রোহের সময় তারা অভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল । তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছু লোককে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে দরবারের স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশদেরকে অবহিত করতেন । সেজন্য আহসানউল্লাহ্ খান ইতিহাসে একজন বিতর্কিত ও নিন্দিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত । বিদ্রোহীরা ব্রিটিশদের কাছে লেখা তার একটি চিঠি আবিষ্কার করার পর সিপাহিরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালায় । কিন্তু বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জাফর তার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে তাকে রক্ষা করেন । হাকিম সাহেব সম্রাটকে অব্যাহতভাবে চাপ দিচ্ছিলেন, যাতে তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি তার সমর্থন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন । সিপাহিদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়লে ব্রিটিশ বাহিনী যখন দিল্লি পুনর্দখল করেন, তখন হাকিম আহসানউল্লাহ্ খান সম্রাটের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন । নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তিনি সম্রাটের বিচারের উদ্দেশ্যে গঠিত সামরিক আদালতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন ।

সম্রাটকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করার পর আহসানউল্লাহ খান বরোদায় চলে যান । ১৮৭৩ সালে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি বরোদায় মারা যান । তার পুত্র হাকিম ইকরামউল্লাহ ব্রিটিশ প্রশাসনে মফস্বল পর্যায়ে কাজ করতেন এবং তার সময়ে 'ডেপুটি সাহেব' হিসেবে পরিচিত ছিলেন ।

স্মৃতিকথার ভূমিকা

এস মোমিনুল হক

১৮৫৭ সালের বিপ্লব-পূর্ব যুগে হাকিম আহসানউল্লাহ খান দিল্লির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম একজন ছিলেন। তিনি নিজেকে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের বংশধর বলে দাবি করতেন। তার পূর্বপুরুষদের একজন খাজা জয়েন-আল-দ্বীন বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাত থেকে কাশ্মীরে আগমন ও সেখানে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে পরিবারটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে হাকিম আহসানউল্লাহ খানের পিতা আজিজুল্লাহ 'তাবিব' অর্থাৎ চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

হাকিম আহসানউল্লাহ খান তার পিতার কাছে 'তিব' বা চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। পড়াশোনা শেষ হলে তিনি একজন 'হাকিম' বা চিকিৎসক হিসেবে তার পেশাজীবন শুরু করেন। কোনো শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের জন্যে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে দিল্লি অনেক বড় জায়গা ছিল বলে তিনি ফিরোজপুর ঝারকার নওয়াব আহমেদ খানের ব্যক্তিগত এস্টেটে চাকরি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ঝাজ্জারে যান এবং সেখানকার প্রধান ফয়েজ মুহাম্মদ খানের অধীনে চাকরি নিয়ে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। তবে পাশাপাশি তিনি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার কারণে ইতোমধ্যে এ পেশায় বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ অবস্থায় তার মনিবের মৃত্যু ঘটায় তিনি শাহি দরবারে চাকরি লাভে সক্ষম হন। ১৮৩৭ সালে বাহাদুর শাহ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি যে শুধু হাকিম আহসানউল্লাহকে চাকরিতে বহাল করেন, তাই নয়, তাকে 'ইহতারাম-উদ-দৌলাহ তাবিত জং' খেতাবে ভূষিত করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। শীঘ্রই তিনি নতুন মোগল সম্রাটের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। সাইয়িদ আহমদ খানের ভাষায়, "কোনো সমস্যা, এমনকি তা যদি 'ওয়াজারাত' বা মন্ত্রিসভার সঙ্গে জড়িত কোনো

বিষয়ও হতো, তাহলেও এই ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা না করে তা পুরোপুরি অথবা আংশিকও নিষ্পত্তি হতো না, কারণ তিনি সঠিক রায় বা সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হতো।

আহসানউল্লাহ খান ভবন নির্মাণের শিল্পে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ১৮৫৪ সালে (হিজরি ১২৭০) তিনি 'হাভেলি বাদল বেগ' নামে পরিচিত একটি ভবন ক্রয় করেন এবং এর পাশে একটি মনোরম ফটক নির্মাণ করেন। ফটকের ওপর বিখ্যাত উর্দু কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব ফারসিতে লিখেছেন:

"নিহাদাহ বেনা আহসানউল্লাহ খাঁ
সর রাহ বদ ইনসা দর দিলকুশা,
কেহ গালিব পিয়ে সাল তারিখ আদ্,
রকম করদ দর-ই-দিলকুশা হাবযা।"

যার বাংলা তরজমা হচ্ছে, "আহসানউল্লাহ খান রাস্তার পাশে এমনভাবে এত মনোরম একটি ফটক নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন যে, গালিব এর কালানুক্রম রচনা করতে 'দর-ই-দিলকুশা' লিখেছেন।"

এটা উল্লেখ করা বেশ সংগত হবে যে হাভেলি বাদল বেগ এর যে পাশে এই ফটকটি নির্মিত হয়েছে, সেখানে একসময় অবস্থিত ছিল 'ইতিমাদ-আল-দৌলাহ কমর আল-দ্বীন খান'-এর প্রাসাদ। তার মৃত্যুর পর প্রাসাদটি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। বাদল বেগ একটি অংশ লাভ করেন এবং তখন থেকে এটি তার নামেই পরিচিত ছিল।

সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলের ত্রয়োদশ বছরে তিনি আমাকে একটি গ্রন্থ সংকলনের জন্য আদেশ দান করেন, যে গ্রন্থে মোগল সম্রাটদের এবং সাফাভি বংশের মতো অন্যান্য রাজবংশের কিছু শাসকের জন্ম তারিখ, তাদের সিংহাসনে আরোহণ এবং মৃত্যুর ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত থাকবে। গ্রন্থটি সংকলন করেন মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন হুসাইন, যেটি পরিচিত হয়েছিল 'মিরাত-উল আশবাব সালাতিন আসমান জাহ' নামে। হাকিম আহসানউল্লাহ খান গ্রন্থটির চিত্রলিপিকার গোলাম আলী খান ও বাবর আলী খান এবং লেখককে তার কাজে সহায়তা করেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি হাকিম আহসানউল্লাহ খানের আনুগত্য সত্ত্বেও জীবনের শেষ বছরগুলোতে তাকে অনেকটা অখ্যাত ও নিঃস্ব অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত তাকে ব্রিটিশ নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে এবং তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না।

কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব ১৮৫৮ সালের ১ এপ্রিল হাকিম আহসানউল্লাহ খানের শ্যালক হাকিম গোলাম নজফ খানকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, "হাকিমের ওপর নজর রাখার জন্য যে সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছিল, তাদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি যেভাবে থাকতে চান তাকে সেভাবে থাকার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নগরীর বাইরে যেতে পারবেন না। তাকে সপ্তাহে একবার কাচারিতে হাজিরা দিতে হবে। এখন তিনি কাচ্চাবাগের পেছনে মির্জা জগনের বাড়িতে বসবাস করছেন। সফদর আমার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। আমি হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে উদগ্রীব। কিন্তু আমি যেতে পারছি না, কারণ আমাকে সতর্ক থাকতে হবে," (খতুত-ই-গালিব, দ্বিতীয় খণ্ড)।

পরবর্তীতে তাকে তার বাসভবন ফেরত দেওয়া হয় এবং তাকে নিজ বাসভবনে ওঠার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অবাধে চলাফেরার সুযোগ ছিল না। স্বাধীনতার জন্য যে বিপ্লব ছিল, সেই বিপ্লবের সময় ব্রিটিশের পক্ষে এবং বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার পুরস্কার হিসেবে তিনি মাসিক দুশো রুপি ভাতা লাভ করেন। বিপ্লবের আগে তিনি পদমর্যাদা ও শ্রদ্ধা উপভোগ করতেন, তা তিনি আর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হননি। অতএব, দিল্লিতে তার জীবন সুখকর ছিল না। অবশেষে নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে তাকে দিল্লি ত্যাগ করতে হয়। দিল্লি ছাড়ার পর তিনি ভারতের বর্তমান গুজরাট রাজ্যের বরোদা শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি পুরোপুরি বিস্মৃত অবস্থায় ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবে হাকিম আহসানউল্লাহ খানের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও কলঙ্কজনক ছিল। তিনি দৃঢ় ধারণা পোষণ করতেন যে, মোগল বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা যেহেতু চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামেমাত্র অস্তিত্ব নির্ভর করছে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের সদিচ্ছার ওপর। অতএব, তার মতে সম্রাট কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করা ও তাদের অসন্তুষ্ট করা সম্পূর্ণ আহাম্মকিপূর্ণ এবং তাদের ক্ষমতার বিপরীতে কিছু করা পুরোপুরি পাগলামির কাজ হবে। ১৮৪৬ সালের ১৩ নভেম্বর তারিখে বোম্বের 'আহসানুল আখবার' একটি ঘটনা প্রকাশ করে, যা থেকে কোম্পানির অফিসারদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একটি ধারণা পাওয়া যায়।

পত্রিকাটিতে লেখা হয়:

“হাকিম আহসানউল্লাহ বাহাদুর সম্রাটকে বলেছেন, সাহিব কালান বাহাদুর (অর্থাৎ প্রতিনিধি) তার ওপর ক্রুদ্ধ। তিনি জানতে চান যে, তার হৃদয় থেকে ক্রোধ দূরীভূত করার জন্য তার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। মহান সম্রাট সাহিব কালানকে লিখেন, ‘হাকিম আহসানউল্লাহ খান সদিচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তি; তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া সংগত নয়। সেজন্য আপনার উচিত আপনার হৃদয় থেকে তার প্রতি অসন্তোষ দূর করা এবং হৃদয়কে ক্রোধমুক্ত করা’।” সাহিব কালান মহান সম্রাটের নির্দেশ পালন করেন এবং তার হৃদয়ে জমে থাকা ময়লা ও অসন্তোষ ঝেড়ে ফেলে হৃদয় পরিশুদ্ধ করেন। সম্রাটের দয়াশীলতায় হাকিম সাহিব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতি এই আনুকূল্যের জন্য মহান সম্রাটকে শুকরিয়া জানিয়ে তার অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি ও তার ভূখণ্ডের বিস্তার কামনা করে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে তার আনুগত্য ও নিবেদিত থাকার প্রমাণ দেন।

দেশীয় সিপাহিদের বিপ্লব দমনে ব্রিটিশদের উদ্যোগে হাকিম আহসানউল্লাহ খানের সহায়তা দানের প্রচেষ্টার কথা দীর্ঘদিন গোপন থাকেনি। বিপ্লবী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানতেন যে, তিনি ইংলিশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করছেন এবং মোগল দরবারের খবরাখবর পাচার করতে ইংরেজদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছেন। এক পর্যায়ে বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করতেও চেয়েছিলেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর যদি এ সময় হাকিম আহসানউল্লাহ খানের সমর্থনে তার পাশে না দাঁড়াতেন, তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই তার জীবন সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। (এ সম্পর্কে মির্জা গালিব ১৮৫৭ সালের ওপর ফারসি ভাষায় লেখা তার গ্রন্থ ‘দাস্তানবু’তে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হাকিমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী এক ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তার সাবেক পৃষ্ঠপোষককে হত্যা করতে। কারণ তিনি তার গোপনীয়তা জানতেন। অতঃপর তিনি গুজব ছড়ান যে, হাকিম একজন গুপ্তচর এবং ব্রিটিশদের বন্ধু। এ খবর বিপ্লবীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। কিন্তু সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে হাকিম আহসানউল্লাহ খানকে নিরাপত্তা দেওয়ার কারণে বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও তারা হাকিমের বাড়িতে হামলা করে ও লুণ্ঠন চালিয়ে তার প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। লোকটি তার উপসংহারে উপনীত হয়েছিল যে, ‘খাঁটি বংশজাত কোনো ভৃত্যের পক্ষেও তার মনিবের প্রতি এহেন আচরণ করা সম্ভব হতো না’।)

হাকিম আহসানউল্লাহ্ খান সাধারণভাবে একজন সঠিক বিচারবুদ্ধির ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবীদের পরাজয় এবং ব্রিটিশ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তার বিজ্ঞতার জন্য তাদের দ্বারা প্রশংসিত হন, যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির প্রতি ঝুঁকে ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে 'নুসরাতনামা'র লেখক তার নীতির কথা এভাবে তুলে ধরেছেন : "সময়ের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকজন সাধারণত যা করেন, তা বিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা বর্জিত নয়। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হাকিম আহসানউল্লাহ্ খান এবং শেষ মোগল সম্রাটের পত্নী রানি নওয়াব জিনাত মহল। তারা শাহি 'শুক্কাহ' বা বিশেষ বার্তাবাহক পাঠিয়ে আগ্রার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে বিপ্লব শুরু হওয়ার খবর জানান এবং তার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। এই 'শুক্কাহ'র মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট গভর্নর উত্তর পাঠান, "এই ঘটনাগুলো জেনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আপনারা অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবেন যে নিকট ভবিষ্যতে এই অপকর্মকে নস্যাৎ করা হবে।"

কামালউদ্দীন হায়দার আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, "হাকিম আহসানউল্লাহ্ খান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতিগুলো যথাযথভাবে পূরণ করলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে তার সেবার বিনিময়ে তাকে পুরস্কৃত করার কথা বিবেচনা করেনি।" ইংলিশকে দেওয়া হাকিম আহসানউল্লাহ্ খানের তিনটি প্রতিশ্রুতি ছিল: ১) তিনি সম্রাটকে বিপ্লবীদের সঙ্গে যেতে দেবেন না; ২) মোগল শাহজাদাদের গ্রেফতারের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেবেন; এবং ৩) মোগল শাহি প্রশাসনকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করবেন।

সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ওপর হাকিম আহসানউল্লাহ্ খানের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইতিহাস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বাহাদুর শাহ জাফর ব্রিটিশ বিরোধী বিশাল শক্তিকে নেতৃত্ব প্রদানের মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। এমনও হতে পারে যে বিদ্রোহীরা তাকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করায় তার মনে তার বংশের ঐতিহ্যের ধারা ক্ষীণ হলেও জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কারণ তখনও সমগ্র ভারতে মোগল শাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের এক ধরনের শ্রদ্ধা ও আচ্ছন্নতা ছিল। অতএব তিনি স্বেচ্ছায় অথবা অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এই মহাবিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের বয়স আশি বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। তার ইচ্ছাশক্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বা সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন